Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 01 - 06
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতাল পুরাণে গান ও গাথাকবিতা

ফ্রেডরিক মান্ডি
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ
Email ID: fredrickmandi.fm@gmail.com

Received Date 16. 03. 2024
Selection Date 10. 04. 2024

Keyword

Santal, Literature, cultural, Custom, Story, Mythology, Traditionl, Songs.

Abstract

Stories, tales, rhymes, songs etc, have been learned orally in Santali language since long ago. Literature in this language started much later. The initiation phase began at the hands of the English missionaries. But the first Santal who wrote and published books on his own efforts was Majhi Ramdas Tudu. Name of the book written by him is 'Kherwal Vansha Dharam Puthi'. Ramdas Tudu presents the mythology, customs and traditional stories of the Santals in this book. Different in small episodes Sometimes the stories are told through songs he narrated many stories. In the book Santal society has distinctive social, cultural and although words of religious practice are found, Bengali the influence of Purana can be seen in some places. Story-Many songs are listed along with the story done in the book. Story through songs Image can be found. This is a strange song and his rhythms make us wonder. Said this essay on Santal Purana and its songs briefly discussed.

Discussion

সাঁওতালি ভাষা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পায় ২০০৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর। একেবারেই সাম্প্রতিক। কিন্তু লোকসংস্কৃতির উপাদানে ভরপুর এই ভাষায় অনেক কাল আগে থেকেই গল্প, কাহিনি, ছড়া, গান ইত্যাদি মৌখিক ভাবেই চর্চিত হয়ে এসেছে। এই ভাষার মৌখিক সাহিত্যের উপাদান অন্যান্য ভাষা থেকে কোন অংশে কম নয়। লিখিত সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল অনেক পরে। কারণ হিসেবে দেখা যায়, নগর জীবন থেকে অনেক দূরে বনে, পাহাড়ে বসবাসরত সাঁওতাল জনজাতি অনেক পরে লেখা পড়া শুরু করেছিল। এছাড়া জীবিকার প্রয়োজনে ঘুরে বেড়ানো খেটে খাওয়া এই মানুষদের সময় ছিল না সাহিত্য চর্চা করার। এর থেকেও বড় সমস্যাটি হল, এই জনজাতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। সাহিত্য চর্চার জন্য এদের কাছে নির্দিষ্ট কোন লিপি ছিল না। তাই অবস্থান অনুযায়ী আঞ্চলিক লিপিতেই নিজের ভাষার সাহিত্য চর্চার কাজ চালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে বড় সমস্যা যেটি দাঁড়ায়, এক প্রদেশের সাঁওতাল অন্য প্রদেশের সাহিত্য পাঠ করতে পারে না। কারণ সেই লিপি তার কাছে অজ্ঞাত। নতুন লিপি শিখে সাহিত্যরস আস্বাদন করা অনেকের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সময়ে যেমন অলচিকি ও রোমান লিপি একে এপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাঁওতালি ভাষায় লিখিত সাহিত্যের সূচনা আধুনিক কালের ঘটনা। ইংরেজ মিশনারিদের হাত ধরে সাঁওতালি সাহিত্যের সূচনাপর্বটি শুরু হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে বালেশ্বরে আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্থাপিত হয়। ঐ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা

Rev. j. Philips সাঁওতালি ভাষা শিখে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি বই ছাপান। সাঁওতালি ভাষায় এটিই প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা হরফে ছাপা হয়েছিল। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত নানা উপকথা, ধাঁধা ও গান এই বইটির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তারপর ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'An Inrtoduction to the Santali language' প্রকাশ করেন। এটি একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা হলেও এতে প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতালি শব্দ লিপিবদ্ধ ছিল।

এর পর চার্চ মিশনারি সোসাইটির E.L Puxley ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি ছোট অভিধান প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম- 'A Vocabulary of Santali Language'. এটি ১৮৬৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাইবেলের কাহিনি 'Gospel of Mathew'-এর সাঁওতালি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তার পরে বেনাগাড়িয়া মিশন প্রেস স্থাপিত হলে, সেখান থেকে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'A Grammar of the Santali Language' প্রকাশিত হয়। এভাবেই শুরু হয়েছিল সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের যাত্রা পথ।

পরিমল হেমব্রম তাঁর 'সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন-

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর আশি দশকের শেষ কয়েক বছর আগের থেকে অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর কুড়ি দশক পর্যন্ত সময়সীমাকে সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের আদি বা প্রতিষ্ঠা পর্ব বলা হয়। ১৮৮৭ সালে কলেয়ান গুরু কথিত ও স্ক্রেফস্‌রুড সাহেব লিখিত 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকেই সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়।"[১]

হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির পূর্বপুরুষদের কথা, বইটি রোমান হরফে সাঁওতালি ভাষায় লেখা হয়েছিল। সাঁওতালদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীত-নীতির কথা এই বইটিতেই লেখা হয়েছিল। এছাড়াও এখানে বেশকিছু গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে গানগুলির বয়স জানা না গেলেও, সেই যুগে এর গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। সাঁওতাল জনজাতির পুরাণ ও রীতি-নীতির প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে পাঠক সমাজে বইটির গুরুত্ব আজও সমান ভাবেই সমাদর পায়।

'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' প্রকাশিত হওয়ার কিছু সময় পরে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একজন সাঁওতালের নিজের চেষ্টায় লেখা প্রথম বই। বইটির নাম 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি'। এর লেখক মাঝি রামদাস টুডু সাঁওতাল সমাজের রীতি-নীতি ও নিজেদের প্রচলিত কাহিনিগুলিকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম সংস্করণে বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৮। লেখাগুলি ছিল মোটা বাংলা অক্ষরে ছাপা। যার ভাষা ছিল সাঁওতালি। বইটিতে কাঠে খোদাই করা কিছু ছবিও ছিল। মাঝি রামদাস টুডুর এই 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করেই বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচনায় আমরা অগ্রসর হব।

এই বইটির প্রথম সংস্করণ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখেছিলেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সুনীতিকুমার লিখেছেন -

> "বইখানি দেখিয়া আমি বড়ই খুশি হই। নিজের জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি ও সামাজিক পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীল একজন সাঁওতাল সজ্জন এই বই লিখিয়াছেন। সাঁওতাল পুরাণ কাহিনির কতকগুলি ছবি নিজ হাতে আঁকিয়া তাহার ব্লক তৈয়ার করাইয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। সাঁওতাল পুরাণ কথার জন্য এই বই হইতেছে একটি মূলগ্রন্থ। স্বাধীনভাবে সংগ্রহের মর্য্যাদা রামদাস টুডু মাঝিকে দিতে হয়। রামদাস টুডু মাঝি এই জন্য প্রত্যেক স্বজাতীর প্রেমিক বা মানব প্রেমিকের নমস্য।"[২]

'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। পরে দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক কিছুই সংযোজন করা হয়েছিল। ১৮৩টি ছোট ছোট পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে গল্পের ছলে কখনও আবার গানের মধ্য দিয়ে নানা কাহিনির বর্ননা করেছেন মাঝি রামদাস টুডু। একটি পর্বের কাহিনির সঙ্গে অন্য পর্বের ধারাবাহিক মিল পাওয়া যায়। কখনও আবার নতুন পর্বে অন্য একটি কাহিনির সূচনা হয়েছে। ১১ থেকে ৪৫ অবধি পৃথিবীর ধ্বংস ও পুনরায় সৃষ্টি, ঠাকুরের হাতে হাঁস হাঁসলির জন্ম, পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়ির জন্ম ও তাদের সন্তান সন্ততির বিস্তার লাভ-এর কাহিনিগুলি এই পর্বে পাওয়া যায়। ৪৬ থেকে আবার কারমু ধারমু উপাখ্যান শুরু হয়েছে।

'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' থেকে 'খেরওয়াল বাংশা ধরম পুথি' বইটির কাহিনিগুলি একটু আলাদা। এর উপস্থাপন রীতিও একটু ভিন্ন ধরনের। বইটিতে সাঁওতাল সমাজের স্বতন্ত্র সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির কথাগুলি পাওয়া গেলেও, বাংলা পুরাণের প্রভাব কিছু জায়গায় লক্ষ করা যায়। ৩৪ তম পর্বে দেখা যায়, 'মারাঙ বুরু' লাঙল তৈরি করার জন্য লুগু বুরুতে গিয়েছিলেন। এদিকে 'জাহের-এরা' অপেক্ষায় অস্থির হয়ে পড়েন। মারাঙ বুরু ফিরে আসছে না দেখে জাহের-এরা নিজের হাতে মিথি ঘষে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মিথি মন্ত্রবলে মশায় রূপান্তরিত হয়ে মারাঙ বুরুকে কামড়ে ছিল। এই কাহিনির সঙ্গে বাংলায় লেখা শিবায়ন কাব্যে 'শিবের নিকট পার্বতীর উঙানি মশা প্রেরণ' কাহিনির কিছু মিলটা পাওয়া যায়।

রামদাস টুডু তাঁর গ্রন্থে 'ইতুৎ সিঁদুর রেয়াঃ লাকচার কাথা' অর্থাৎ বিয়ের সময় সিঁদুর পরানোর কথা প্রসঙ্গে বাবা ঈশ্বর 'চাঁদো বঙ্গা'র নাম স্মরণ করার কথা বলেছেন। বিয়ের সময় বর যখন কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে, ঠিক সেই সময় উপস্থিত দুই পক্ষের আত্মীয় পরিজনেরা 'হরি বল্ল হরি বল হরি' ধ্বনি উচ্চারণ করবেন। এছাড়াও 'নওয়া দ পাপ চাবাঃ রেয়াঃ বাবা ঈশ্বর চাঁদ বঙ্গারেয়াঃ ঞুতুম ঞুম' অর্থাৎ পাপ থেকে নিস্তার লাভের জন্য পিতা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার কথা বলেছেন রামদাস টুডু। এই 'চাঁদ বঙ্গা' পিতা ঈশ্বর আর কেউই নন, ইনি হলেন হরি। এই হরি'র নাম তিন বার 'হরি বল হরি বল হরি'-নাম স্মরণ করার কথা গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন আসতেই পারে সাঁতালদের পুরাণে হরি'র অবস্থান কোথায়? কে এই হরি? যার নাম স্মরণ করে সাঁওতালদের নিস্তার লাভের কথা বলেছেন রামদাস টুডু। আসলে হরি হল হিন্দুদের দেবতা বিষ্ণুর আরেকটি নাম। হরি শব্দের অর্থ 'যিনি হরণ করেন' (পাপ)। হরি অর্থে তাকেই বোঝায় যিনি অন্ধকার ও বিভ্রম দূর করেন। যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত বাধা দূর করেন। ভগবতগীতা ও মহাভারতের মতো হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে হরির একাধিক নাম উল্লেখ আছে। এই নামগুলি হল - বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ, মাধব, দামোদর, গোবিন্দ, গোপাল প্রভৃতি।

এছাড়াও রামদাশ টুডু যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন, সেটি দেখে আর্য্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্তী বলেই মনে হয়। ৭ নং নক্সায় 'আবগে বঙ্গাকে' গণেশ ও 'গড়া আবগে বঙ্গা'কে কালী বলেই মনে হতে পারে। ১১ নং নক্সার ছবিটিতে লুবু কুশু অর্থাৎ লব ও কুশ রামের দুই পুত্রের নাম পাই। এছাড়া বাল্মীকি মুনিকে 'নাগা বাল্মীক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামের স্ত্রী সীতার প্রসঙ্গ-ও এখানে বাদ পড়েনি। ৩১ নং ছবিটিতে কারমু আর ধারমু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে এক দেবীর সামনে। সেই দেবী দুর্গা ছাড়া আর কেউই নন।

মানুষের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের বুকে আদিকাল থেকে বহু জাতি পদচারণা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা জাতিদের মধ্যে দন্ধ এবং সংঘাত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আদান প্রদান হয়ে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। যার ফলস্বরূপ মিশ্র সংস্কৃতির তৈরি হয়েছিল। অনার্য জাতির ভাষা, আচার, ব্যবহার ও কৃষ্টির নানা অংশ আর্য সভ্যতায় স্থান পেয়েছিল, আবার এর ঠিক উল্টোটিও ঘটে ছিল। যার প্রতিফলন 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' গ্রন্থের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আর্য সংস্কৃতির প্রভাবই এই গ্রন্থের মধ্যে আংশিক ভাবে লক্ষ করা যাছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের সাঁওতাল দেবতার-জগতের গ্রহণের পরিচায়ক চিত্র পাওয়া যাইবে। শুদ্ধ সাঁওতাল জগতের প্রাচীন দেবকাহিনি বা পুরাণ কথাও আছে। কিন্তু রামদাস টুডু নিজের জীবনে যে ভাবে মিশ্র বা মিশ্রক্রিয়মান 'হড়' বা সাঁওতাল ধর্মজগৎ দেখেছেন, তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। যে উপায়ে প্রাগার্য্য দেবকাহিনি ও আর্য্য দেবকাহিনি মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, উপস্থিত এই পুস্তকে সেই পদ্ধতির একটি প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে।"[৩]

একজন সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন সাঁওতাল প্রথমবার নিজের চেষ্টায় বই লিখেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে গ্রন্থের দ্বারা সেটি প্রকাশ করলেন। ছোটগল্প-কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে অনেক গানের তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে বইটিতে। বিভিন্ন পর্বে গানগুলি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে। গান ও কাহিনিগুলি এখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে গানের মধ্য দিয়েই কাহিনির চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অন্যতম

উপাদান ব্যালাড বা গাথাকবিতার সঙ্গে এই গানগুলির মিল পাওয়া যায়। গানের গঠনগত দিকটির কিছু ক্ষেত্রে গাথাকবিতার লক্ষণ আমাদের চোখে পড়বে। গাথাকবিতার মত সহজ ও কথ্য ভাষারীতি এই গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট। গানগুলি বর্ণনাত্মক, নাটকীয় ভঙ্গীতে স্বল্প সংখ্যক চরিত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে। গাথাকবিতার মূল রচয়িতা যেমন অজ্ঞাতই থেকে যান, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ব্যালাড বা গাথাকবিতার এক বিশেষ ছন্দ এবং স্তবক বিন্যাস থাকে। সব ক্ষেত্রে যে তা অনুসরণ করা হয় এমনটা বলা যায় না। এই গানগুলির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ‘খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি’ বই-এর গানগুলিতে কোনও নির্দিষ্ট ছন্দরীতি পালন না করলেও গল্পের খেই ও গানের সুরে কখনও কখনও এগুলি সজীব হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল অবধি গাথাকবিতা একটি বহু ব্যবহৃত কাব্যরূপ। লোকপ্রিয় কোনও উপাখ্যান বা কাহিনিকে ছোট ছোট স্তবকে খুঁটিনাটি বর্ণনা করে, আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থাপন করাটাই গাথাকবিতার লক্ষ্য থাকে। ‘খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি’ বইটিতে কারমু ধারমু উপাখ্যান প্রসঙ্গে গাথাকবিতার রীতিটি আমাদের চোখে পড়বে। এখানে কারমু ও তাঁর মায়ের কথপোকথন গানের মধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতালি গানের বাংলা তর্জমাটি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল।

গানের বাংলা অনুবাদ

কোথায় পেলি বাবা ধারমু মাথায় বাঁধার কাপড়
কোথায় পেলি কোমরের ঐ বাঁশি
কোথা থেকে নিয়ে এলি এতভালো ধেনু গাই।
. . .
ভিক্ষা করতে পাঠালে মাগো সকাল বেলাতে
তোমার কথায় চলে গেলাম চাম্পা আর গাড়ে।
চাম্পা আর গাড়ের পাশে ছিল একটি নদী
লুগুবুরু ঘান্টা বাড়ি থেকে সেটি এসেছে,
টাটী ঝারি সাঁওয়ায় সকড়া তুপুন নদীটির নাম।
. . .
নদীর ধারে ছিল একটি কদম গাছ,
তার নিচেই বিশ্রাম নিয়েছিলাম।
ঘুম পেলে শুয়ে পড়েছিলাম,
স্বপ্নে দেখলাম কারাম গোঁসাইকে।
আমাকে বললেন, ধারমু আর কত ভিক্ষা করবি,
আমি একটা কথা বলছি শোন।
নদীর ধারে দেখতে পাবি কারাম গাছ,
তার দুটি ডাল নিয়ে এসে মাটিতে গাড়বি
সেখানে তিনবার প্রণাম ও নমস্কার করবি
কারাম পাতার মাদল বানাবি
সেই মাদল বাজিয়ে নাচ করবি।
ধারমু তুই যদি এমন করিস
একটা ধেনু গাই, মাথায় বাঁধার কাপড়
আর একটা গাঙ্গি বাঁশি তোকে দেব।”[৪]

‘খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি’ বইটির মধ্যে যে গানগুলি আছে, তাতে কোন গানের কি সুর হবে তার উল্লেখ করা আছে। গানের সুর ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের তাল-এর সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। গানের সুরগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের। অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন কোন কাহিনি বলার সময় এক ধরনের সুরে গান গেয়ে গেয়ে কাহিনিটির বর্ণনা করা হয়ে থাকে। একে ‘কাহিনি সেরেঞ সুর’ বা কাহিনি গানের সুর বলা হয়। এমন করেই পাতা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেরেঞ, বাপ্লা সেরেঞ, বির সেরেঞ, ঝার্ণী সেরেঞ, চুমোড় সেরেঞ, ঠাড় সুর, লাঁগড়ে সেরেঞ, ঝিকা সেরেঞ, দং সেরেঞ, বাহা সেরেঞ, দাঁশায় সেরেঞ, সহরায় সেরেঞ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার গান ও তার সুরের উল্লেখ পাওয়া যায় রামদাস টুডুর বইটিতে। একটি 'বাপ্লা সেরেঞ' বা বিয়ের গানের অনুবাদ নিচে দেওয়া হল—

গানের অনুবাদ

"প্রেমের সুতোয় বাঁধো এদের, তোমারই সন্তান এরা
একই রকম দেখতে এদের, সংসারে আজ পা বাড়াল;
পিতৃস্নেহ দিয়ে এদের তুমি ভালো রেখো,
নিজ ভূমিতেই যেন এরা থেকে যায়
যেমন দু'ফোঁটা জল লেগেই থাকে শালুক ফুলে।
হে প্রভু, এরা তোমারই সন্তান
এদের জীবন এক করে দাও।
ওগো প্রভু এদের দেখ, তোমার ভালোবাসায় রেখো
মাতা-পিতার মত যত্ন নিয়ে চোখে চোখে রেখো,
ভুল পথে গেলে তুমি ওদের মানা করো
আলোয় না হোক অন্ধকারে তুমি ওদের হাত ধর।"[৫]

এই বইটিতে যে তাল-এর নাম আমরা পাবো সেগুলিও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বাজানো হয়। কারাম চুমাড় রু, রিঞ্জা ঠাড় এতহব রু তড়াও, রিঞ্জা ঠাড় রু তড়াও, রিঞ্জা ঠাড় রু, রিঞ্জা ঠাড় ঝিকা রু, কারাম চুমাড় এনেচ্ রু, খান্ডিয়া রিঞ্জা রু তড়াও, খান্ডিয়া রিঞ্জা এনেচ্ রু। এই তালগুলি কারাম দেবতার পূজো উপলক্ষে পর্যায়ক্রমে বাজানো হয়। এছাড়াও, 'ঝিকো এনেচ্ রু তড়াও', 'ঝিকো এনেচ্ রু' নানা ধরনের তালের উল্লেখ পাবো বইটিতে।

সাঁওতালি গানগুলি গাওয়ার সময় তাল ও গানের মধ্যে বিট্ বা রিদিম-এর সামঞ্জস্য থাকে না। কথাটি শুধু ট্র্যাডিশনাল গান গাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ট্র্যাডিশনাল গান বলতে, গতানুগতি ভাবে গেয়ে আসা বিভিন্ন পালা পরবের গান। গ্রাম্য প্রকৃতির পরিবেশে নিজের আবস্থান অনুযায়ি নির্ভেজাল ভাবে যে গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। কারাম নাচের পর্ব অনুযায়ি বিভিন্ন তাল বাজিয়ে নাচ করা হয়। প্রথম পর্বে থাকে কারাম চুমোড় অর্থাৎ কারাম দেবতার স্তুতী। এই চুমোড়-এর সময় 'তড়াও' অর্থাৎ সূচনা পর্বের তাল বাজানো হয়। বাজানোর সময় টামাক, তুম্‌দাঃ অর্থাৎ ধামসা ও মাদল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু সাঁওতালি নাচ ও গানে তুম্‌দাঃ অর্থাৎ মাদলের মাধ্যমেই মূল তালগুলিকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। মাদল ছাড়া সাঁওতালি গানগুলি ফাঁকা এবং অসম্পূর্ণ শোনায়। মাদলের তালেই মন্ত্র মুগ্ধের মত আবদ্ধ থাকে নাচের আসরের মানুষগুলি।

কারাম পুজোর চুমোড়া তালটি নিচে উল্লেখ করা হল—

"দিং দাং (২) ধাতিঙ, ধাতিঙ হেতাঙ দিপিঙ দাঙ (১০০)
দিঙ দাতাঙ ভেতাঙ গুড়ুম,
দাঙ দাতাঙ ভেতাঙ গুড়ুম দাঙ,
তিঙ ধাতিঙ ধাতিঙ তেতাঙ দিপিঙ দাঙ দিঙদা (২)"[৬]

এই তালগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। তাই হয়ত রামদাস টুডু গানের সঙ্গে সঙ্গে তালগুলিকে সংরক্ষণের জন্য এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছারাও লোহোরী এনেচ্ রু, দং রু, বাহা এনেচ্ রু, গোই দাঁড়া রু, ইত্যাদি বিভিন্ন তালের সন্ধান পাওয়া যায় 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' বইটিতে।

ধামসা ও মাদলের তালে নাচতে নাচতে সাঁওতালি গান গাওয়া হয়। আবার কিছু গান বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গাওয়া হয়ে থাকে। নানা তাল ও বৈচিত্রে ভরা গানের সুরগুলি বাদ দিয়ে, গানের গঠনের দিকে লক্ষ করে সাহিত্য ধারার দিকটিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেটি হল কবিতার সঙ্গে গানের গঠনগত সাদৃশ্য। কবিতার বিভিন্ন প্রকার ভেদের মধ্যে গীতিকবিতার একটি বিশেষত্ব আছে। এই গীতিকবিতারই একটি ধারার নাম গাথাকবিতা। গাথাকবিতার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও তেমনটি বলা যাবে তা কিন্তু নয়। গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনা করলে এই সব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গানগুলিকে ক্ষীণ মনে হয়। কারণ গানগুলির মধ্যে নাটকীয়তা থাকলেও সবক্ষেত্রে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও গীতিকবিতার অন্যতম লক্ষণগুলি হল, আত্মমগ্ন অনুভবের তীব্রতা, সংবেদনশীল ভাষা ও সুরের অন্তর্লীন স্পর্শ, যেটি পাঠক মনকে অভিভূত করবে। সহজ ভাবে বললে, কবি ও পাঠকের নিবিড় ভাবে রস সংযোগ হবে। কিন্তু 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি' গ্রন্থের গানগুলিতে এই বৈশিষ্টগুলি সব ক্ষেত্রে আমরা পাই না। তাই এগুলিকে গীতিকবিতা না বলে, গাথাকবিতার পর্যায়ভুক্ত করলে ভুল হবে না।

রামদাস টুডু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত করে বইটি লিখেছিলেন। তাই সমকালীন সমাজের চিত্রটি তাঁর লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। যে সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের সাঁওতাল জাতির মানুষরা গ্রহণ করেছিলেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাঁওতাল জগতের প্রাচীন দেব-কাহিনি বা পুরাণ কথাই বইটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। এর থেকেও বড় বিষয় যেটি সেটি হল, পুরাণ ও সাংস্কৃতির চিরাচরিত ইতিহাস উন্মুক্ত হয়েছে একজন সাঁওতাল লেখকের হাতে। সমাজ সচেতন একজম মানুষ প্রথমবার নিজের সংস্কৃতির রীতি-নীতির কথাগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। সুনীতকুমার লিখেছেন—

> "পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন রামদাস টুডুর বইয়ের সংগ্রহ ও আঁকা ছবি দেখিয়া আমারই মত বিস্মিত ও প্রীত হন। তিনি বলেন যে রুশ দেশ হইলে (তিনি তখন কিছু কাল হইল তাঁহার শেষ রুশ দেশে অবস্থান সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন) সরকার হইতে এই বই ছাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইত। রুশ দেশের কথা কেন, সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল যে কোন সভ্য দেশেই এই রূপ ব্যবস্থা হইত।"[৭]

লোকসংস্কৃতির উপাদানে ভরপুর এই বইটিতে পুরাণ কথা, দেব কাহিনি, তন্ত্র-মন্ত্র এবং সমাজের আচার পদ্ধতির বিভিন্ন দিকগুলি গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গানের বিভিন্ন ধারা ও সুরের নানা দিক যেমন আছে, তার সঙ্গে তালের বৈচিত্র আমাদের বিস্মিত করে তোলে। সাহিত্যের বিচারে সহজ ও সরল কথ্য রীতির জন্য গানগুলি আমাদের কাছে কবিতা আকারেই ধরা দেয়। সাঁওতালি সাহিত্যে আগ্রহী পাঠকমন এটি পাঠ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, এই গানগুলি থেকে গাথাকবিতার রস যেমন আস্বাদন করতে পারবেন। তেমনি প্রাচীন সাঁওতাল সমাজের রীতি-নীতি ও প্রচলিত কাহিনিগুলির বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন।

Reference:

১. পরিমল হেমব্রম, সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০২৩, নির্মল বুক এজেন্সি, ২৪বি কলেজ রোড, কলকাতা-৯, পৃ. ১৩৮

২. রামদাস টুডু রেস্কা, খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি, সপ্তম মুদ্রণ ২০২২, খেরওয়াল তরাও আখড়া, বালিটিকরি, পৌইলান, নদীয়া, পৃ. ভূমিকা (iii)

৩. তদেব, পৃ. ভূমিকা (v)

৪. তদেব, পৃ. ৭৫

৫. তদেব, পৃ. ১৭৩

৬. তদেব, পৃ. ৮৯

৭. তদেব, পৃ. ভূমিকা (v)